প্রথম আলো
সোমবার, ৩০ জুলাই ২০১২

বছরে ক্ষতি সাত হাজার কোটি টাকা

শেখ সাবিহা আলম ●

অপুষ্টির কারণে বাংলাদেশকে প্রতিবছর সাত হাজার কোটি টাকার ক্ষতি গুনতে হচ্ছে। দেশের তীব্র অপুষ্টিতে ভোগা শিশুরা জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে পিছিয়ে থাকছে, প্রাপ্ত বয়সেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শতভাগ অবদান রাখতে পারছে না। সমস্যা সমাধানে পুষ্টি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন। সম্প্রতি স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ইউএসএআইডির যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়। 'ইনভেস্টিং ইন নিউট্রিশন নাউ : এ স্মার্ট স্টার্ট ফর আওয়ার চিলড্রেন, আওয়ার ফিউচার' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ করা বাজেটের কমপক্ষে ১১ শতাংশ প্রতিবছর পুষ্টি খাতে ব্যয় করতে হবে। এতে করে ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা ৭০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিলের পুষ্টি বিশেষজ্ঞ মো. মহসীন আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৫০ হাজার শিশুমৃত্যুর পরোক্ষ কারণ অপুষ্টি। শিশু হয়তো মারা যাচ্ছে ডায়রিয়া বা নিউমোনিয়ায়, কিন্তু এদের সিংহ ভাগেরই তীব্র অপুষ্টিতে ভোগার ইতিহাস আছে।

নতুন এই গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে এ মুহূর্তে অপুষ্টির সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া না হলে ২০২১ সাল নাগাদ তীব্র অপুষ্টিতে ভুগে নয় লাখ ৪৫ হাজার ৪২৫ শিশুর প্রাণহানি ঘটবে।

এক প্রশ্নের জবাবে দেশের শীর্ষ পুষ্টিবিদ এস কে রায় *প্রথম আলোকে* বলেন, জাতীয় পুষ্টিসেবা কার্যক্রমে আগামী পাঁচ বছরের জন্য এক হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বছরে ৩০০ কোটি টাকার বরাদ্দ নিয়ে প্রতিটি গ্রামে প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌছা সম্ভব হবে না।

২০১২ সালে কোপেনহেগেনে বিশ্বের শীর্ষ পুষ্টিবিদদের এক সম্মেলনে বলা হয়, অতিদরিদ্র দেশগুলোও যদি অপুষ্টির সমস্যা সমাধানে এক ডলার বিনিয়োগ করে, বিনিময়ে দেশটি ৩০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করতে পারে।

অপুষ্টি কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে

'ইনভেস্টিং ইন নিউট্রিশন নাউ : এ স্মার্ট স্টার্ট ফর আওয়ার চিলড্রেন, আওয়ার ফিউচার'-এর প্রধান গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের শিক্ষক সুশীল চন্দ্র হাওলাদার। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, অপুষ্টি কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি বাধাগ্রস্ত করছে, তা খতিয়ে দেখতে তিনি ও তাঁর দল চারটি বিষয় বিবেচনায় নিয়েছে। এগুলো হলো : অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুরা রোগে ভোগে বেশি, স্কুলে তাদের উপস্থিতির হার কম এবং ফল ভালো হয় না, প্রাপ্ত বয়সে তারা দেশের অর্থনীতিতে ঠিকভাবে অবদান রাখতে পারে না এবং অপুষ্টিতে আক্রান্ত বাবা-মা অপুষ্ট শিশুর জন্ম দিতে পারেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা দেখেছেন, অপুষ্টির কারণে বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষতি বছরে সাত হাজার কোটি টাকা।

অপুষ্টির সঙ্গে আর্থিক ক্ষতির এই সম্পর্ক নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গবেষণা হয়েছে। এসব গবেষণায় পুষ্টিবিদেরা দেখিয়েছেন, অপুষ্টিতে আক্রান্ত মানুষ কম মজুরি পান, তাঁদের শারীরিক সক্ষমতা অন্যদের তুলনায় কম, বেশি রোগে ভোগার কারণে তাঁরা প্রায়ই কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। এক গবেষণায় দেখা গেছে, পূর্ণ বয়সে কোনো ব্যক্তির উচ্চতা ১ শতাংশ কম হলে উৎপাদনশীলতা ১ দশমিক ৪ শতাংশ পর্যন্ত কম হতে পারে (হাদ্দাদ অ্যান্ড বুয়েস, ১৯৯১)। অপর এক গবেষণায় বলা হচ্ছে, উচ্চতা ১ শতাংশ কম হলে উৎপাদনশীলতা ২ থেকে ২ দশমিক ২৪ শতাংশ পর্যন্ত কমে (কোলফিল্ড, ২০০৬)। এ ছাড়া লৌহের অভাবজনিত রক্তশূন্যতা রোধ করা গেলে একজন মানুষের উৎপাদনশীলতা ৫ থেকে ১৭ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে অপর এক গবেষণায় (অল্ডারম্যান অ্যান্ড বেহরম্যান, ২০০৪, বিশ্বব্যাংক ২০০৬, এইডি ২০০৩)।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও ইউএসএআইডির গবেষণায় সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, অপুষ্টির সমস্যা সমাধান করা না গেলে ২০১৫ সালের মধ্যে অতিদারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিরসন, সবার জন্য শিক্ষা, শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা, এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণের যে লক্ষ্যমাত্রা আছে, তা পূরণ করা সম্ভব হবে না।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ও জনমিতি জরিপ, ২০১১ (বিডিএইচএস) অনুযায়ী, বাংলাদেশে বয়সের তুলনায় উচ্চতা কম বা খর্বাকৃতির শিশু ৪১ শতাংশ, উচ্চতার তুলনায় রুগ্‌ণ শিশু ১৬ শতাংশ এবং বয়সের তুলনায় ওজন কম ৩৬ শতাংশ শিশুর। ২০০৭ সালের বিডিএইচএস প্রতিবেদনে খর্বাকৃতির শিশুর হার ছিল ৪৩ শতাংশ, উচ্চতার তুলনায় রুগ্‌ণ শিশু ১৮ শতাংশ ও বয়সের তুলনায় ওজন কম, এমন শিশুর হার ছিল ৪১ শতাংশ।

পুষ্টিবিদেরা বলছেন, অপুষ্টির সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের যে অগ্রগতি, তা খুবই ধীর। ১৯৯৬-৯৭ থেকে ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত প্রায় ১০ শতাংশ হারে অপুষ্টি কমেছে, কিন্তু ২০০০-২০০৭ সাল পর্যন্ত বয়সের তুলনায় কম ওজনের শিশুর সংখ্যা কমেছে ১ শতাংশ হারে। একই সময়ে খর্বাকৃতি কমেছে ৮ শতাংশ হারে এবং উচ্চতার তুলনায় কম ওজনের শিশুর সংখ্যা বেড়েছে ৫ শতাংশ হারে।

কোথায় কোথায় বাড়াতে হবে বিনিয়োগ

জাতীয় জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক (আইপিএইচএন) এখলাসুর রহমান বলছেন, ভ্রূণ থেকে পরবর্তী এক হাজার দিন পর্যন্ত শিশুর পুষ্টির বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। জীবনচক্রের প্রতিটি পর্যায়কে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়ে সে অনুযায়ী কর্মসূচি হাতে নেওয়া প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও ইউএসএআইডির ওই গবেষণা প্রতিবেদনে লৌহের অভাবজনিত রক্তশূন্যতা, জন্মকালীন কম ওজন, ভিটামিন 'এ' ও আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ, খর্বাকৃতি, উচ্চতার তুলনায় কম ওজন ও বয়সের তুলনায় কম ওজন রোধে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

গবেষকেরা বলছেন, পুষ্টি কর্মসূচির মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালীন পুষ্টি, মায়েদের পুষ্টি, স্বল্প ওজন, খর্বাকৃতি ও তীব্র অপুষ্টির সমস্যা সমাধানে কর্মসূচি নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে চারটি মূল বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে : বয়ঃসন্ধিকালীন পুষ্টি নিশ্চিত করা; বাল্যবিবাহ রোধ করা ও প্রথম সন্তান দেরিতে নেওয়া; গর্ভকালীন মায়ের পুষ্টি নিশ্চিত করা, মা ও শিশুর সর্বোচ্চ যত্ন নেওয়া এবং ছয় মাস পর্যন্ত শিশুকে শুধু মায়ের দুধ খাওয়ানো, ছয় থেকে ২৪ মাস পর্যন্ত পুষ্টিকর ও সুষম খাবারের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

এ ছাড়া প্রথম এক হাজার দিনের জন্য পৃথক ও শক্তিশালী কর্মসূচি নেওয়া দরকার। ভ্রূণ থেকে দুই বছর বয়স পর্যন্ত সময়কে গুরুত্ব দিতে হবে।

এসব কর্মসূচি প্রথম বছরেই যে বাস্তবায়নযোগ্য নয়, তার ইঙ্গিত রয়েছে গবেষণায়। গবেষকেরা বলছেন, প্রথম বছর ১০০টি উপজেলা, দ্বিতীয় বছর ২০৪টি উপজেলা এবং তৃতীয় বছরে ২০৪টি উপজেলায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ২০১১-২০২১ সাল পর্যন্ত এই খাতে নয় হাজার থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা গেলে সমস্যার সমাধান সম্ভব।